অবতরণিকা ও সারসংক্ষেপ
বিচূর্ণ আশা, অপসৃত দিগন্ত, নতুন সীমানা

দিনা এম সিদ্দিকী

পশ্চাৎপট ও সারাংশ

২০০৮ সালের রাজনৈতিক দৃশ্যপট বছরের শেষে এসে নাটকীয়ভাবে পাল্টে যায়। সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে প্রায় দুই বছর জরুরি অবস্থা চালু থাকার পর ১৭ ডিসেম্বর জরুরি অবস্থা তুলে নেয়া হয়। জরুরি অবস্থার মধ্যে প্রায় সব মৌলিক অধিকার স্থগিত থাকে, সেই সাথে বন্ধ থাকে রাজনৈতিক সব কর্মকাণ্ড। প্রচণ্ডভাবে প্রত্যাশিত কিন্তু দু'বার বাতিল হওয়া জাতীয় নির্বাচন শেষ পর্যন্ত ভোটারদের ব্যাপক উৎসাহ ও অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে শান্তিপূর্ণভাবেই অনুষ্ঠিত হয় ২৯ ডিসেম্বর। বছরের মধ্যে ঘটে যাওয়া এই দুটি বিশেষ ঘটনার প্রভাব সামগ্রিক মানবাধিকার পরিস্থিতিতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যেভাবেই হোক, নিশ্চিতভাবেই ছিল।

জাতীয় নির্বাচনের মাত্র দুই সপ্তাহ আগে বিজয় দিবসের দিন ১৬ ডিসেম্বর মধ্যরাত থেকে জরুরি অবস্থা তুলে নেয়া ছিল অন্য অনেক কিছুর মধ্যে প্রগাঢ়ভাবে প্রতীকী। নির্বাচিত সরকারের কাছে ক্ষমতার সেই অতিপ্রত্যাশিত হস্তান্তর কি সত্যিই গুণগত কোনো পরবর্তন আনবে? নির্বাচনের মুহূর্তেও এই উদ্বেগ বিরাজ করছিল। দুই বছর অনির্বাচিত সরকারের অধীনে থাকার পর রাজনৈতিক সংস্কৃতি কি সত্যিই পরিবর্তিত হবে? দেশ কি বৃত্ত ঘুরে এর নিজের অবস্থানে আবার ফিরে আসবে? আসলে বাংলাদেশ তো সেই দুটি প্রধান রাজনৈতিক দলের পালাক্রমে ফিরে আসার ভারসাম্য রক্ষা করে, যে দুটি দল পরিচালিত হয় সেই একই দু'জন ব্যক্তি দ্বারা এবং যে দুটি দলের নিজস্ব কাঠামোতেই গণতান্ত্রিক চর্চা নেই। আবার, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শুরু করা পরিবর্তনের ফলে রাজনীতির প্রকৃতিতে কি কোনো মৌলিক

পরিবর্তন আদৌ হয়েছে, বিচারহীনতার সংস্কৃতি কি কমতে শুরু করেছে, দলীয়করণ ও অগণতান্ত্রিক আগ্রাসী মনোভাবের কি আদৌ কোনো পরিবর্তন হয়েছে? এসব প্রশ্ন মাথায় রেখে এই অবতরণিকা অংশে ২০০৮ সালের মানবাধিকার পরিস্থিতিকে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।

একনজরে ২০০৮ সাল : বিচূর্ণ আশা এবং অপসৃত দিগন্ত

২০০৭ সালের শুরুতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার নির্বাচন অনুষ্ঠান ব্যবস্থাকে পুরো বিন্যাস করে রাজনৈতিক দলগুলোর সংস্কার এবং প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নেয়া দুর্নীতির মূল উৎপাটনে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়। ২০০৮ সালের নভেম্বরে যখন তত্ত্বাবধায়ক সরকার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়, তখন দেখা গেল রাজনৈতিকভাবে কতগুলো ভুল পদক্ষেপের কারণে এবং বাহ্যিক কিছু প্রভাবক যেমন বিশ্বখাদ্য সঙ্কট, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধি প্রভৃতির ফলে তাদের সেই দুর্দান্ত প্রতাপ অনেকাংশেই ফিকে হয়ে গেছে।

মানবাধিকার ও নীতিগত বিষয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অবস্থান ২০০৮ সালেও ছিল অসম এবং অসঙ্গতিপূর্ণ। পরোয়ানা ছাড়া গ্রেফতার এবং নিবর্তনমূলক আটকাদেশের অনুমোদনকারী জরুরি ক্ষমতা অধ্যাদেশ ও বিধিমালাতে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির জামিন আবেদন করার ক্ষেত্রে আরোপিত নিষেধাজ্ঞা অব্যাহত ছিল। সাবেক মন্ত্রীসহ অন্যান্য উচ্চপর্যায়ের রাজনৈতিক নেতা যারা এযাবৎ প্রচলিত ফৌজদারি আইনের ধরাছোঁয়ার বাইরে ছিল তাদের ক্ষেত্রে জরুরি বিধিমালা প্রয়োগ করা হয়। সমাবেশের স্বাধীনতা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং ধর্মীয় স্বাধীনতার ক্ষেত্রে সরকারের নিষেধাজ্ঞা ছিল অব্যাহত (ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৪ ও ১৪৪ ধারা এবং ঢাকা মেট্রোপলিটন অধ্যাদেশ প্রয়োগের মাধ্যমে)। কিন্তু এই নিষেধাজ্ঞার প্রয়োগ ছিল চোখে পড়ার মতো বাছাইকৃত– একেকজনের ক্ষেত্রে একেক রকম (আরো দেখুন ২০০৭ সালের প্রতিবেদন)।

সরকার ধর্ম ও রাষ্ট্রীয় নীতির সম্পর্ক ও পার্থক্যের মধ্যে তালগোল পাকিয়ে ফেলে। ধারণা করা হয়, এরূপ তালগোল পাকানোর পেছনে কারণ হলো দেশের সঙ্কটপূর্ণ মুহূর্তে ধর্মীয় মৌলবাদী গোষ্ঠীর কাছে সরকারের নতিস্বীকার এবং ধর্ম ও ধর্মীয় সংস্কৃতিকে রাজনৈতিক দৃশ্যপটে ঢোকার অনুমতি দেয়া। এর ফলে লিঙ্গগত সমতা অথবা মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে পদদলিত করার মতো চড়া মূল্য দিতে হয় (উদাহরণ হিসেবে পরবর্তীকালে আলোচিত নারী উন্নয়ন নীতি এবং সরকারি মূর্তি ভাঙা অংশ দেখুন)।

সাংবাদিকদের আতঙ্কজনক অবস্থার ধারাবাহিকতা এই সরকারের আমলেও অব্যাহত ছিল। কিন্তু হঠাৎ করে জাতীয় নির্বাচনের সময় গণ-মাধ্যমের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এই সময় জাতীয় নির্বাচনের খবর ব্যাপকভাবে গণমাধ্যমে প্রচারিত ও প্রকাশিত হতে থাকে। তবে বছরজুড়েই গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ধীরে ধীরে প্রসারিত হয়, এমনকি জরুরি অবস্থার মধ্যেও। বস্তুত নির্বাচনের সময় গণমাধ্যমে প্রচারিত ও প্রকাশিত খবরে নির্বাচন প্রক্রিয়া অগ্রাধিকার পেয়েছে। প্রার্থীদের যোগ্যতা সংক্রান্ত মৌলিক বিষয়াবলি গণমাধ্যমের খবরে প্রায় অনুপস্থিতই ছিল, অথচ মানবাধিকার প্রশ্নে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ উদ্বেগের বিষয়। তবে একটা ব্যতিক্রম ছিল যুদ্ধাপরাধীদের ক্ষেত্রে। এ সময় প্রার্থীদের যুদ্ধাপরাধের সাথে সম্পৃক্ত থাকার খবর ব্যাপকভাবে প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়। টেলিভিশন চ্যানেলগুলো এ সংক্রান্ত খবর গুরুত্বসহ প্রচার করে, জনগণের সাধারণ আলোচনাতেও বিষয়টি ব্যাপকভাবে আলোচিত হয় এবং প্রিন্ট মিডিয়া বাঘা বাঘা প্রার্থীদের যুদ্ধাপরাধের সাথে জড়িত থাকার খবর ফলাও করে প্রকাশ করে। গণমাধ্যমের একমুখী খবর প্রচারের ধরন একটা উদাহরণ দিয়ে পরিষ্কার করা যায়। যেমন- প্রার্থীদের পেশা, শিক্ষা, সম্পদ, পূর্বে ফৌজদারি অপরাধের সাথে সম্পৃক্ততা প্রভৃতি তথ্য হলফনামাসহ নির্বাচন কমিশনে দাখিল করা ছিল বাধ্যতামূলক এবং নির্বাচন কমিশন এর নিজস্ব ওয়েবসাইটে এই তথ্যগুলো প্রকাশ করে। কিন্তু গণমাধ্যমে প্রার্থীদের যোগ্যতাসংক্রান্ত এই মৌলিক বিষয়গুলো খুবই সামান্য গুরুত্ব পায় অথবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে একেবারেই গুরুত্ব পায়নি।

আমলাতন্ত্র এবং প্রশাসনকে সামরিকীকরণ করার প্রক্রিয়া ২০০৮ সালেও অব্যাহত ছিল, এর কারণ সম্ভবত জনবিচ্ছিন্ন সামরিক বাহিনীকে জনগণের সাথে সম্পৃক্ত করা। বাছাইকৃতভাবে আইনের প্রয়োগ, সরকারের অতিআগ্রাসী মনোভাব এবং কখনো কখনো আইন-বহির্ভূত পদক্ষেপের কারণে ২০০৭ সালে শুরু হওয়া ব্যাপকভাবে প্রচারিত ও আলোচিত 'দুর্নীতি দমন অভিযান' ২০০৮ সালের শেষে এসে শক্তি হারিয়ে ফেলে। সরকার হঠাৎ করে পেছনের দিকে দৌড়াতে শুরু করে এবং দুর্নীতিবিরোধী অভিযানের মাধ্যমে এযাবৎ অস্পৃশ্য রাজনৈতিক ও ব্যবসায়িক অঙ্গনের রাঘববোয়ালদের বিচারের মুখোমুখি করার দৃপ্ত প্রত্যয় থেকে সরকার হঠাৎ সরে যেতে শুরু করে। দুর্নীতির অভিযোগে দায়ের করা মামলাগুলো গতিহীন হয়ে পড়ে এবং আটককৃতরা ছাড়া পেয়ে যায়। ধারণা করা হয়, জাতীয় নির্বাচনে প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপির অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতেই

সরকার এভাবে উল্টা রথে যাত্রা করে। প্রধান দুটি রাজনৈতিক দলের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে ২০০৮ সালে ছাড়া পান দুর্নীতির অভিযোগে আটক সাবেক দুই প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনা। মুক্তির পরই তাদের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া ফৌজদারি মামলাগুলো স্তিমিত হয়ে পড়ে এবং কোনো কোনো মামলার সমাপ্তিও ঘটে। একইভাবে উচ্চ পর্যায়ের আরো অনেক রাজনৈতিক নেতা এ সময় ছাড়া পেয়ে যায়। যেমন– সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার পুত্র বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব তারেক রহমানকে জামিনে মুক্তি এবং লোক দেখানোভাবে তাকে চিকিৎসার জন্য বিদেশে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়। কিন্তু অন্য সাধারণ বন্দিদের ক্ষেত্রে সরকারের এই মনোভাব ছিল একেবারেই অনুপস্থিত।

মানবাধিকার কর্মীদের অভিযোগ, বিচার পরিচালনার সময় এবং অন্য অনেক ক্ষেত্রে সরকার সম্পূর্ণ বিচার ব্যবস্থাকেই উপহাসের সামগ্রী বানিয়ে ফেলেছে এবং বিচার ব্যবস্থার নিরপেক্ষতা ও অখণ্ডতা নষ্ট করেছে। গণ-মাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য থেকে প্রতীয়মান হয়, হাইকোর্টের একটি বেঞ্চে মাত্র একদিনে ২৯৮ জনকে জামিন দেয়া হয়, প্রতিটি আদেশ প্রদানের জন্য সময় নেয়া হয় এক মিনিটের একটু বেশি। সুপ্রিম কোর্ট বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ থেকে এই ঘটনার কোনো তদন্ত করা হয়নি; কিন্তু যে পত্রিকায় এই খবর ছাপা হয় সেই পত্রিকার বিরুদ্ধে আদালত অবমামনার মামলা দায়ের করতে কোনো ভুল করা হয়নি। দুর্নীতির মামলার এরূপ অধঃগতির ফলে একজন মানবাধিকার কর্মীর বক্তব্য হলো, "এখন ন্যায়বিচার বলতে কিছু নেই, কারণ 'অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের' কোনো বিচার হচ্ছে না। আগে কিছু লোক ছিল আইনের ঊর্ধ্বে, কিন্তু এখন প্রকৃতপক্ষে সবাই আইনের ঊর্ধ্বে।"

অধিকন্তু মনে করা হয় যে, রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরীণ সংস্কার ব্যাপকভাবে ব্যর্থ হয়েছে। যদিও নির্বাচন কমিশন প্রার্থীদের জন্য অযোগ্যতা নির্ধারণ করে এবং রাজনৈতিক দলগুলোর নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করে; কিন্তু এই বিধান সবার জন্য নিরপেক্ষ ও কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হয়নি। প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো নিবন্ধনের শর্ত পূরণ না করলেও তাদের নিবন্ধন দেয়া হয়েছে। প্রার্থীদের অযোগ্যতা নির্ধারণ এবং ব্যক্তিগত তথ্য প্রকাশ সংক্রান্ত নির্বাচনী সংস্কারের উদ্দেশ্য ছিল, যেন অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছ তথ্যসংবলিত ও যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীরা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে। কিন্তু দেখা গেল, দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত এমনকি সাজাপ্রাপ্ত অনেক প্রার্থী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছে। অনেক ক্ষেত্রে সাজাপ্রাপ্ত বা দণ্ডিত পুরুষ প্রার্থীরা তাদের প্রক্সি হিসেবে স্ত্রীদের নির্বাচনে দাঁড় করায়। নির্বাচনের একেবারে শেষ

মুহূর্তে সর্বোচ্চ আদালত সিদ্ধান্ত প্রদান করে যে, আপিল বিচারাধীন অবস্থায় দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবে। এর ফলে সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ সংক্রান্ত নির্বাচন কমিশনের যে নিষেধাজ্ঞা ছিল তা অকার্যকর হয়ে যায় এবং দুর্নীতির দায়ে সাজাপ্রাপ্ত অনেকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। সাবেক সেনাপ্রধান, জাতীয় পার্টির নেতা এবং আওয়ামী লীগের 'মহাজোট' প্রার্থী এইচ এম এরশাদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। নির্বাচন কমিশনে দাখিলকৃত তার ব্যক্তিগত তথ্যসংবলিত হলফনামা থেকে দেখা যায়, তার বিরুদ্ধে চারটি ফৌজদারি মামলা বিচারাধীন (একটি খুনের এবং অন্য তিনটি দুর্নীতি সংক্রান্ত), আরো চারটি মামলা তদন্তাধীন এবং দুটি মামলায় বিচার শেষে দণ্ড প্রদান করা হয়েছে। ফৌজদারি অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট এরূপ প্রার্থীকে মনোনয়ন দেয়ার অর্থ হলো ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থা এবং নৈতিক দায়বদ্ধতাকে সরাসরি অবজ্ঞা করা।

রাজনৈতিক দুরভিসন্ধির বিরুদ্ধে নাগরিকদের প্রতিরোধ : আগের মতোই ব্যালট পেপারে 'না-ভোট' দেয়ার বিধান অন্তর্ভুক্তি প্রচলিত রাজনৈতিক পছন্দের বিরুদ্ধে ভোটারদের মধ্যে চেতনা তৈরি করার একটা উদ্যোগ। কিন্তু এরূপ 'না-ভোট' প্রয়োগ করা নিয়ে জনগণের মধ্যে আলোচনা ও সচেতনতা ছিল খুবই কম, যার ফলশ্রুতিতে এই ভোট দেয়ার সংখ্যাও ছিল কম। নির্বাচনে সামান্য কিছু সহিংসতা, ত্রাস ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের খবর প্রকাশিত হয়। আওয়ামী লীগ এবং এর শরিক দলগুলো [ওয়ার্কার্স পার্টি, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (ইনু), সাবেক সেনাপ্রধান এরশাদের জাতীয় পার্টি এবং ইসলামী ঐক্য জোটের একাংশ] বিপুলভাবে বিজয়ী হয়। বিএনপি এবং এর ডানপন্থি শরিক দল, বিশেষ করে জামায়াতে ইসলামী ব্যাপকভাবে পরাজিত হয়। জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থীরা মাত্র দুটি আসনে জয়লাভ করে। অনেক উচ্চ পর্যায়ের জামায়াত নেতা যারা গণমাধ্যমসহ সব স্থানেই অতি-দৃশ্যমান ছিল এবং যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ এনে নাগরিকরা আন্দোলন করছে– তারা এই নির্বাচনে পরাস্ত হয়।

নির্বাচনী ফলাফলে প্রতীয়মান হয় যে, জনগণ যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের পক্ষে এবং রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ধর্মকে অপব্যবহার করাসহ দুর্নীতির বিপক্ষে এবং সে মতোই তাদের রায় ঘোষণা করেছে। সর্বোপরি, এটা একটা অনন্যসাধারণ অর্জন, যেখানে নির্বাচনের মাত্র দুই সপ্তাহ আগে নির্বাচন অনুষ্ঠান নিয়েই অনিশ্চয়তা ছিল। কারণ তখন পর্যন্ত বিএনপি নির্বাচনে অংশগ্রহণের বিষয়ে অনীহা প্রকাশ করছিল। নির্বাচিত সরকারের কাছে ক্ষমতা

হস্তান্তর করার ব্যাপারে তত্ত্বাবধায়ক সরকার এবং সেনা প্রশাসনের যে অঙ্গীকার ছিল এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে তা পূরণ হয়েছে বলে মন্তব্য করা যায়। অন্য অনেক আইনি ও নীতিগত সংস্কারের পাশাপাশি যেসব নির্বাচনী ও আইনি সংস্কার নির্বাচন অনুষ্ঠান ও নির্বাচন প্রক্রিয়ায় ভূমিকা রেখেছে তা নিম্নে আলোচনা করা হলো।

নির্বাচনী সংস্কার, আইনি উন্নয়ন এবং নতুন নীতি

- নির্বাচন কমিশনকে সংস্কার করে কার্যকর করার উদ্যোগ নেয়া হয়। এর ফলে একটি নতুন ভোটার তালিকা তৈরি হয়। নতুন ভোটার তালিকায় বাদ পড়া অনেক ধরনের মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, জাল ভোট এবং প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে ভোট দেয়ার সুযোগ অনেকাংশে কমিয়ে আনা হয়। সবদিক থেকেই এটা ছিল গত দুই বছরের সবচেয়ে বড় অর্জন, যদিও জনগণের ওপর নজরদারি করার কিছু ব্যবস্থা আবশ্যিকভাবে চাপিয়ে দেয়া নিয়ে কিছু উদ্বেগ থেকেই গেছে।
- গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধিত) অধ্যাদেশ ২০০৮ জারি করা হয়। এর ফলে রাজনৈতিক দল নিবন্ধন ও মনোনয়ন পদ্ধতিকে গণতান্ত্রিক করার একটি দিকনির্দেশনা পাওয়া যায়। এছাড়া ছাত্র সংগঠনগুলোকে রাজনৈতিক দল থেকে বিচ্ছিন্ন করা, নারীদের জন্য শতকরা ৩৩ ভাগ মনোনয়ন নিশ্চিত করার বিধানও সংশোধিত আইনে সন্নিবেশিত করা হয়। সংশোধিত গণ-প্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ অনুযায়ী রাজনৈতিক দলকে নিবন্ধিত হতে হলে বাংলাদেশের সংবিধানের সাথে দলের সংবিধানের কোনো বিরোধ থাকা যাবে না এবং যেসব রাজনৈতিক দল সাম্প্রদায়িক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত তারা নিবন্ধিত হতে পারবে না। এ কারণে, যদিও জামায়াতে ইসলামীকে নিবন্ধন না দেয়ার জন্য নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ দাখিল করা হয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দলটি নিবন্ধিত হয়। দলটি এর গঠনতন্ত্র সংশোধন করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকে স্বীকার করে নেয় এবং অমুসলিমদের জন্য এই দলের সদস্য হওয়ার বিধান সংযোজন করে।
- জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রার্থীদের জন্য নির্বাচন কমিশন একগুচ্ছ অযোগ্যতা নির্ধারণ করে। কিন্তু দেখা যায়, ঋণখেলাপিদের জন্য নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরি করা হয়েছে। ২০০৮ সালের প্রথম গণ-প্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশে বিধান ছিল যদি ঋণখেলাপিরা মনোনয়নপত্র দাখিলের কমপক্ষে ছয় মাস পূর্বে তাদের ঋণ পুনঃতফসিলভুক্ত না করে, তাহলে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবে না। কিন্তু পরবর্তীকালে সংশোধনী এনে সময়সীমা ছয় মাস থেকে কমিয়ে মাত্র এক সপ্তাহ করা

হয়। অর্থাৎ মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার এক সপ্তাহ পূর্বে যদি কেউ তার ঋণ পুনঃতফসিলভুক্ত করে তাহলে তার নির্বাচনে অংশগ্রহণে কোনো বাধা নেই।

- বছরের একেবারে শেষে এসে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গঠন করা হয়। যদিও আইনে এই কমিশনের কার্যক্ষেত্র অনেক সীমিত এবং আন্ত র্জাতিক মান বজায় রেখে কমিশন গঠন করা হয়নি, তারপরও বিচার বিভাগের সাথে জড়িত থাকার দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন বিচ-ারপতিকে কমিশনের সভাপতি নিয়োগ দেয়াকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে দেখা যেতে পারে।
- সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারক নিয়োগের একটি পদ্ধতি তৈরি করার জন্য গঠন করা হয় সুপ্রিম জুডিশিয়াল কমিশন। সঠিক দিকে ধাবিত হওয়ার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে এটাকে বিবেচনা করা যেতে পারে; কিন্তু কমিশনে বিচার বিভাগীয় সদস্যের তুলনায় নির্বাহী বিভাগের সদস্যদের আধিক্য এবং সদস্য নিয়োগ সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট মাপকাঠি না থাকায় সুপ্রিম জুডিশিয়াল কমিশন শুরুতেই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। কমিশনের সদস্যদের নিয়োগ দেয়া হলে এই প্রশ্ন বিতর্কে রূপ নেয়।
- তথ্য অধিকার অধ্যাদেশ ২০০৮ জারি হওয়ায় আশা জাগে যে, তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার এতোদিনের দাবি বাস্তবে রূপ নিতে যাচ্ছে। কিন্তু সবধরনের গোয়েন্দা ও নিরাপত্তা সংস্থাকে আইনের আওতা-বহির্ভূত রাখায় এই দাবি দোদুল্যমান হয়ে পড়ে।
- আদালত অবমাননা অধ্যাদেশ ২০০৮ প্রণীত হয়। আদালত অবমাননার ক্ষেত্রে এই অধ্যাদেশ আদালতের এখতিয়ারকে কমিয়ে এনেছে এবং আদালতের রায় বা সিদ্ধান্তের গঠনমূলক সমালোচনা করার অনুমতি প্রদান করেছে। তবে সরকারি কর্মচারীদের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগ আনার ক্ষেত্রে এই আইন কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করেছে, যা হাইকোর্টে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখিও হয়েছে।
- নাগরিক সমাজ বিশেষ করে ছাত্র ও শিক্ষকদের বারংবার দাবির মুখে শেষ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন শিক্ষাঙ্গনে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে একটি খসড়া নীতিমালা আইন মন্ত্রণালয়ে জমা দিয়েছে।
- নারী অধিকার রক্ষায় সচেষ্ট গোষ্ঠীগুলোর দাবির প্রেক্ষিতে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি গ্রহণ করা হয়েছে, যা মূলত ১৯৯৭ সালের নারী উন্নয়ন নীতিরই প্রতিস্থাপন।
- সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমজিডি) বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি।

নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার

স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে আইনের শাসন বারবার ভূলুণ্ঠিত হয়েছে সব সরকারের দ্বারাই। বিগত কয়েক বছর যাবৎ নির্বাচিত ও অনির্বাচিত সব সরকারই র‍্যাব কর্তৃক বিচার-বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বা নির্যাতন, পুলিশ কর্তৃক নাগরিকদের ব্যক্তিস্বাধীনতা হরণের ঘটনাগুলোকে আইনের উর্ধ্বে রেখেছে। এই ধারা গত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলেও জারি ছিল ষোলোআনা। ২০০৮ সালে র‍্যাব ও পুলিশ দ্বারা ১৭৫ জনকে বিচার-বহির্ভূতভাবে হত্যা করা হয়েছে। সরকার একদিকে যেমন এসব ঘটনায় কোনো তদন্ত করেনি আবার অন্যদিকে র‍্যাব ও পুলিশের এ সংক্রান্ত ক্ষমতাও সীমিত করেনি।

নতুন করে আরো অনেক ক্ষেত্রে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হতে পারে এই আশঙ্কায় জারিকৃত 'সন্ত্রাস দমন অধ্যাদেশ ২০০৮' ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়। এই আইনের মাধ্যমে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে সন্ত্রাস দমনের নামে ব্যাপক ক্ষমতা প্রদান করেছে। এখানে সন্ত্রাসের সংজ্ঞাকে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ না করে বরং উদ্বেগজনকভাবে বিস্তৃত করা হয়েছে। যার ফলে আইনসম্মত ও শান্তিপূর্ণভাবে ভিন্নমত পোষণকারীদের বিরুদ্ধেও এই আইন একটি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার হতে পারে। এই আইনের মাধ্যমে ভিন্নমত পোষণকারীদের হয়রানিমূলক শাস্তি এমনকি মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত প্রদান করতে পারে। অতি দ্রুততার সাথে সন্ত্রাস দমন আইন প্রণীত হলেও অন্যদিকে পুলিশকে কার্যকর ও জবাবদিহিতামূলক করার উদ্যোগ গ্রহণকারী আইন বছর শেষে খসড়া আকারেই থেকে গেছে।

জরুরি অবস্থার মধ্যেই আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা এবং এর প্রতিবাদে আইনি লড়াই এ বছরও অব্যাহত ছিল। ব্যতিক্রম কিছু ক্ষেত্র ছাড়া জরুরি আইনে দায়ের হওয়া মামলায় জামিন আবেদন করা যাবে না– এ সংক্রান্ত জরুরি আইনের বিধান সর্বোচ্চ আদালতের রায়ে বহাল থাকে যা আইনজীবী, মানবাধিকার কর্মী এবং মামলার পক্ষদের দ্বারা ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়। জরুরি আইনে দায়ের হওয়া সব মামলার ক্ষেত্রে জামিন আবেদনের প্রতি এরূপ নিষেধাজ্ঞার ফলে জনগণের অতিপ্রত্যাশিত এবং অকুণ্ঠ সমর্থন পাওয়া সমগ্র দুর্নীতি দমন অভিযানই প্রশ্নের মুখে পড়ে। অবশ্য এর পেছনে আরো অনেক কারণ ছিল, যেমন– দুর্নীতির মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে অতিমাত্রায় বাছাই নীতি, মামলার তদন্তের মন্থরগতি ইত্যাদি। দুর্নীতি দমন কমিশন এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক বড় বড় রাজনীতিক এবং ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে দায়ের

করা দুইশ'রও বেশি দুর্নীতির মামলা হাইকোর্টে আইনি প্রশ্নের সম্মুখীন হয়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এর কারণ ছিল মামলার পদ্ধতিগত ত্রুটি। যার ফলে এসব রাজনীতিক ও ব্যবসায়ী শেষ পর্যন্ত জামিন লাভ করতেও সক্ষম হয়। দুর্নীতির মামলা স্থগিত হওয়া এবং জামিন মঞ্জুর হওয়ার পেছনের কারণ হিসেবে আংশিকভাবে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ও এর বিধিমালার দুর্বলতাকে যেমন চিহ্নিত করা যায়, তেমনি একটা বড় কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায় রাজনৈতিক দুরভিসন্ধিকে– বিশেষ করে ২০০৮-এর ডিসেম্বরের মধ্যে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠান নিয়ে দেশি-বিদেশি রাজনৈতিক চাপ আইনি প্রক্রিয়াকে নিশ্চিতভাবেই প্রভাবিত করেছে।

অপরাধ দমন অভিযানের নামে প্রচলিত আইন এবং জরুরি ক্ষমতা আইনের অপব্যবহারের মাধ্যমে গণগ্রেফতারের ঘটনা অব্যাহত ছিল অন্যান্য বছরের মতোই। ২৯ মে থেকে ১২ জুন পর্যন্ত দেশজুড়ে পরিচালিত 'সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানে' গ্রেফতার করা হয় ২০ হাজারেরও বেশি লোককে।

র‍্যাব ও পুলিশের বিরুদ্ধে অসংখ্য নির্যাতনের অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে এ বছর। এর মধ্যে ভয়ঙ্কর ও নির্দয়ভাবে নির্যাতনের কিছু অভিযোগও অন্তর্ভুক্ত ছিল। যেমন– জয়পুরহাট বারের সহ-সভাপতিকে নির্যাতন, পুলিশ হেফাজতে চারজন নারীকে ধর্ষণ ইত্যাদি। অক্টোবর মাসে হাইকোর্ট র‍্যাবের প্রতি একটি রুল জারি করেন। র‍্যাবের হাতে আটক হওয়া হাসান খান নামের একজনের নিখোঁজ হওয়ার প্রেক্ষিতে রুলটি জারি করা হয়। হাইকোর্ট হাসান খানকে আদালতে উপস্থিত করার জন্য র‍্যাবকে নির্দেশ দেন। আগের বছরে বা তারও পূর্বে সংঘটিত নির্যাতনের ঘটনা যেমন– সাংবাদিক তাসনিম খলিল বা জাহাঙ্গীর আলম আকাশ অথবা এনজিও কর্মী শহিদুলের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক নির্যাতিত হওয়ার ঘটনার কোনো তদন্ত অনুষ্ঠিত হয়নি।

২০০৮ সালে সংখ্যালঘুদের অধিকার

- ২০০৮ সালের মে মাসে হাইকোর্ট ঘোষণা করেন যে, উর্দুভাষী সব তথাকথিত 'আটকেপড়া পাকিস্তানি' অর্থাৎ ১৯৪৭ সালের পরে যারা এ দেশে অভিবাসিত হয়ে এসেছে তারা বাংলাদেশের নাগরিক হওয়ার যোগ্য। হাইকোর্টের এই ঘোষণার পর উর্দুভাষী গোষ্ঠীকে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এটা হাইকোর্টের একটা যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত, যার ফলে ৪০ হাজারেরও বেশি উর্দুভাষী ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যোগ্য হয়।

- এ বছরই প্রথমবারের মতো প্রায় এক লাখ হিজড়া ভোটার তালিকায় নিজেদের নাম অন্তর্ভুক্ত করতে সমর্থ হয় [যদিও তৃতীয় লিঙ্গ হিসেবে তাদের এখনো স্বীকৃতি দেয়া হয়নি]। বেদে জনগোষ্ঠীকে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার ঘটনাও এবার ঘটে প্রথমবারের মতো।
- পার্বত্য চট্টগ্রামেও দুটি গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। হাইকোর্ট একটি গুরুত্বপূর্ণ মামলার রায়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি জেলায় ভিন্ন ভিন্ন তিনটি দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালত প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারকে নির্দেশনা প্রদান করেন। আদালতগুলো জুলাই মাসে প্রতিষ্ঠিত হয়। আশা করা হয়, এই আদালতগুলোতে প্রায় সাড়ে তিন হাজার ঝুলন্ত মামলার বিচার দ্রুততার সাথে নিষ্পন্ন হবে।
- আরেকটি উল্লেখযোগ্য উন্নতি হলো, পার্বত্য চট্টগ্রামে এতোদিনের নিষিদ্ধ মোবাইল ফোন নেটওয়ার্ক চালু করা হয় এ সময়। জুলাই মাসে মোবাইল ফোনের নেটওয়ার্ক স্থাপনের ওপর থেকে এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়।
- তবে পার্বত্য শান্তি চুক্তিতে বিধান থাকলেও নির্বাচন কমিশন পার্বত্য এলাকার জন্য আলাদা কোনো ভোটার তালিকা তৈরি করেনি। যার ফলে সেখানে বসবাসরত বাঙালি সেটলার এবং পাহাড়ি আদিবাসীরা একই কাতারের অন্তর্ভুক্ত হলো।
- অন্যান্য ক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রামের মানবাধিকার অবস্থা অন্যান্য বছরের মতোই ছিল। বাঙালিদের দ্বারা পাহাড়ি আদিবাসীদের ভূমি দখলের ঘটনা এ বছরও অব্যাহত ছিল, কখনো কখনো এরূপ দখলের ঘটনা ঘটেছে সেনাবাহিনীর জ্ঞাতসারে, আবার কখনো কখনো তাদের সহায়তায়। একটি ঘটনায় স্থানীয় একটি বেসরকারি সংস্থার (এনজিও) সম্পৃক্ততার অভিযোগ উঠেছে। ২০০৮ সালের এপ্রিল মাসে রাঙ্গামাটি জেলার সাজেক ইউনিয়নের আটটি আদিবাসী গ্রামে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। মানবাধিকার পর্যবেক্ষকদের মতে, এরূপ ঘটনায় স্থানীয় প্রশাসন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি, যদিও কাছেই একটি সেনাছাউনি ছিল।
- এ বছর তত্ত্বাবধায়ক সরকার ‘অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ ট্রাইব্যুনাল’ এবং ‘আপিল ট্রাইব্যুনাল’ গঠনের ঘোষণা দেয়। অর্পিত সম্পত্তি আইনের ফাঁকফোকরকে ব্যবহার করে এযাবৎ হিন্দুদের যেসব সম্পত্তি দখল করা হয়েছে, তার একটা সুরাহা করতেই এই ঘোষণা দেয় সরকার। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, অন্য অনেক ক্ষেত্রের মতো এক্ষেত্রেও সরকারের ভঙ্গি ছিল প্রভুর মতো। প্রাথমিকভাবে যারা এর দ্বারা লাভবান হবে বা

যাদের স্বার্থরক্ষার জন্য এরূপ বিধান করা হচ্ছে তাদের বা তাদের প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা না করেই সরকার একাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। যাই হোক, এ সংক্রান্ত কোনো পদক্ষেপ পরবর্তীকালে আর দেখা যায়নি। সাধারণ জনগণ এবং ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষের তীক্ষ্ণ সমালোচনার মুখে অর্পিত সম্পত্তি আইন পুনরায় সংশোধনের উদ্যোগও হোঁচট খায়।

- আদিবাসী নেতা চলেস রিচিল এবং অন্যান্য বিচার-বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের তদন্তকাজ একপর্যায়ে এসে থেমে যায়। একজন স্বনামধন্য মানবাধিকার কর্মী রাংলাই ম্রোকে গ্রেফতার করা হয় এবং জরুরি ক্ষমতা বিধিমালার অধীনে সংক্ষিপ্ত বিচার পদ্ধতিতে তাকে দণ্ডাদেশ প্রদান করা হয়। গুরুতর হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার পরও তাকে মুক্তি দেয়া হয়নি।

এভাবে অনেক ক্ষেত্রেই ২০০৮ সালে আদিবাসী এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অধিকারকে নিশ্চিত করা হয়নি এবং অধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা প্রতিরোধে কার্যকর কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। বছরের শেষের দিকে কিছু ঘটনা ছিল মানবাধিকারের জন্য খুবই অশুভ। বিশেষ করে একটা নির্দিষ্ট মহলের ব্লাসফেমি আইনের দাবি যা সংবিধানের সাথে সরাসরি সংঘাতপূর্ণ। কোনো কোনো দলের নির্বাচনী ইশতেহারে এই দাবির প্রতিফলনও দেখা যায়। যেমন– জাতীয় পার্টি এবং জামায়াতে ইসলামী এরূপ আইন তৈরির অঙ্গীকার করে। ব্লাসফেমি আইনের দাবির প্রতি সমর্থন আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে প্রতিফলিত হয়। দলটি ঘোষণা করে যে, নির্বাচিত হলে তারা কোরআন ও হাদিসবিরোধী কোনো আইন প্রণয়ন করবে না। ডানপন্থি দলগুলোর আরো একটি অস্বাভাবিক দাবি ছিল এবং যে দাবির প্রতি সরকারের শ্রদ্ধাবোধও পরিলক্ষিত হয়, সেটা হলো ইসলামি মৌলবাদীরা সেসব শিল্পকর্মকে আপত্তিজনক ও ইসলামবিরোধী বলে চিহ্নিত করেছে, সেগুলোকে সরিয়ে ফেলা। ইসলামি মৌলবাদী গোষ্ঠীরা ঢাকা শহরে অবস্থিত এরূপ কয়েকটি শিল্পকর্মের ওপর চড়াও হলেও সরকারের পক্ষ থেকে তাদের বিরুদ্ধে কার্যকর কোনো ব্যবস্থা নিতে দেখা যায়নি।

নারী অধিকার – ধর্ম, কলা এবং সাংস্কৃতিক রাজনীতি

নারী সংগঠনগুলোর ধারাবাহিক চাপের ফলে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ২০০৮ সালের মার্চ মাসে একটা প্রগতিশীল নারী উন্নয়ন নীতি ঘোষণা করে এবং এই নারী উন্নয়ন নীতি ব্যাপকভাবে বাধারও সম্মুখীন হয় [বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ২০০৫ ও ২০০৬ সালের হিউম্যান রাইটস্ রিপোর্ট]। নারী-পুরুষের সমান উত্তরাধিকারের নীতিকে বাদ দেয়া ছাড়া তত্ত্বাবধায়ক সরকার নতুন নারী

উন্নয়ন নীতিতে ১৯৯৭ সালের মূল নীতিকেই অনুসরণ করেছে। তবে নতুন নীতি ঘোষিত হওয়ার সাথে সাথেই ইসলামি মৌলবাদী গোষ্ঠী তাৎক্ষণিক ও অপ্রত্যাশিতভাবে এর বিরোধিতা শুরু করে। তারা রাজপথে প্রতিরোধ গড়ে তোলে এই যুক্তিতে যে, এই নীতিতে নারীকে পুরুষের সমান উত্তরাধিকার দেয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি করা হয়েছে। ইসলামী ঐক্যজোট এবং কয়েকটি ইসলামি সংগঠন দাবি তোলে যে, ভবিষ্যতে শরিয়াবিরোধী কোনো আইন পাস করা যাবে না। অন্য আরো কিছু ঘটনার মতো এক্ষেত্রেও সরকার রাজপথে হিংস্র আচরণকারী ও বিক্ষোভকারীদের প্রশ্রয় দেয় এবং কখনো কখনো তাদের নিরাপত্তাও দেয়, যদিও রাজপথে এধরনের বিক্ষোভ ছিল সম্পূর্ণভাবে জরুরি আইনের পরিপন্থী।

আশ্চর্যজনক তো বটেই, দুঃখজনক বিষয় হলো সরকার ইসলামি জ্ঞানে পণ্ডিত ব্যক্তিদের নিয়ে এ ব্যাপারে একটি কমিটি গঠন করে। নতুন নারী উন্নয়ন নীতিতে শরিয়াবিরোধী কী কী বিধান আছে তা খুঁজে বের করার জন্য এই কমিটিকে দায়িত্ব দেয়া হয়। সরকার নারী উন্নয়ন নীতির ক্ষেত্রে দ্বৈতনীতি অনুসরণ করে। নারী উন্নয়ন নীতিতে প্রত্যাহার বা সংশোধনও করে না আবার ইসলামি বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশমতে শরিয়াবিরোধী বিধানগুলো মুছেও ফেলে না। সরকার নারী সংগঠন ও নাগরিক সমাজের দাবির প্রতি সমর্থনও জানায় আবার ইসলামি গোষ্ঠীগুলোর দাবি অনুসারে শরিয়াবিরোধী কোনো বিধান না রাখারও ঘোষণা দেয়। ফলে নারী উন্নয়ন নীতির ভাগ্যে যেটাই ঘটুক ইসলামি গোষ্ঠীগুলো এই প্রথমবারের মতো কোনো উন্নয়ন নীতির ব্যাপারে তাদের অন্যায্য দাবি জানানোর সুযোগ পেল। এটা কোনোভাবেই বাংলাদেশের জন্য একটা ভালো নজির সৃষ্টি করলো না।

পরবর্তীকালে ইসলামি মৌলবাদীরা একত্র হয় সরকারি বিভিন্ন মূর্তি ভাঙার জন্য। তাদের দাবি, এসব মূর্তি ইসলামবিরোধী। উনিশ শতকের বাউল সাধক লালন ফকিরের মূর্তি ভেঙে ফেলা হয়। মূর্তিটি মাত্র মাসখানেক আগেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার তৈরি করে। এরপর তারা অন্য মূর্তিগুলোও ভাঙার পরিকল্পনা করে। কিন্তু নাগরিক সমাজের প্রচণ্ড বাধার ফলে তারা পিছু হটতে বাধ্য হয়। ইলসামী ঐক্য জোট তখন বাংলাদেশের বাঙালি ও মুসলিম সংস্কৃতিকে আলাদা করার এবং পুনর্গঠনের একটা চেষ্টা চালায়।

অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার

সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার বিশেষ করে খাদ্যের উৎপাদন ও সরবরাহ ক্রমাবনতির ফলে মানুষের জীবনধারণ এবং বাসস্থানের নিশ্চয়তা হুমকির

মুখে পড়ে, যা বছরজুড়েই ছিল একটা বড় উদ্বেগের কারণ। বিশ্ব খাদ্য ও জ্বালানি সঙ্কটের প্রভাব বাংলাদেশের ওপরও পড়ে এবং উভয় বিষয়ের অপ্রতুলতা ধীরে ধীরে খারাপের দিকে ধাবিত হয়। আধুনিক উদারনীতি কৃষিক্ষেত্রে বিনিয়োগকে নিরুৎসাহিত করে এবং 'অলাভজনক' শিল্পের ব্যয় কমানোকে উৎসাহিত করে, খাদ্যের সরবরাহ ও মজুদ বাড়াতে সরকারের ভুল পদক্ষেপ, বিশ্ববাজারে খাদ্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, নির্মাণ শিল্পের নিম্নগতি ইত্যাদি সবই প্রত্যক্ষভাবে জীবনধারণের উপকরণের ওপর প্রভাব বিস্তার করে যা সূক্ষ্মভাবে খাদ্যের ঘাটতিকে আরো নিম্নগতি করে।

আবাসনের অধিকার নিশ্চিত করতে শহর এলাকার জমি বরাদ্দে সরকারের যে পক্ষপাতমূলক মনোভাব তা প্রতি বছরের মতো এবারও অব্যাহত ছিল। এর ফলে শহর এলাকার জমিগুলো বরাদ্দ দেয়া হয় বি-লাসবহুল ভবন নির্মাণের জন্য আর এর প্রভাবে এ বছরও নিম্ন আয়ের বস্তি বাসীদের তাদের আবাসস্থল থেকে উচ্ছেদ করা হয়। জরুরি অবস্থায় মৌলিক অধিকার স্থগিত থাকা সত্ত্বেও বিগত বছরগুলোর মতো এবারও আদালত জোরপূর্বক বস্তিবাসীদের উচ্ছেদ না করার জন্য সরকারকে নির্দেশনা প্রদান করেন; কিন্তু এসব নিষেধাজ্ঞাকে অগ্রাহ্য করে রাতারাতি উচ্ছেদ করা হয় অনেক বস্তি। ২০০৭ সালে যেসব বস্তি উচ্ছেদ করা হয়েছিল সেসব বস্তি বাসীর বিকল্প আবাসনের জন্য সরকারের এক খণ্ড জমি বরাদ্দ দেয়ার যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল, বছরের শেষ পর্যন্ত সেই প্রক্রিয়া বাস্তব রূপ লাভ করেনি।

জরুরি অবস্থার মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রম বন্ধ রাখার নিষেধাজ্ঞা যদিও সেপ্টেম্বরে এসে আংশিকভাবে প্রত্যাহার করা হয়েছিল, কিন্তু শ্রম আইন সংশোধন করে বন্দর এলাকায় ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রমের ওপর নতুন করে বাধানিষেধ আরোপ করা হয়। ইমারত নির্মাণ বিধিমালা সঠিকভাবে প্রয়োগ না হওয়ার কারণে শ্রমিকের নিরাপত্তার বিষয়টি অমীমাংসীতই থেকে গেছে। এ কারণে ২০০৮ সালে একশ' জনের ওপর শুধু নির্মাণ শ্রমিককে প্রাণ হারাতে হয়েছে। জাহাজ ভাঙা শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের জন্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে এবং ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিক বা তার পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেয়ার জন্য হাইকোর্ট সরকারের প্রতি একটি নির্দেশনা জারি করেছেন। বকেয়া বেতন-ভাতা অথবা কর্মক্ষেত্রে ন্যূনতম নিরাপত্তার দাবিতে পাটকল শ্রমিক ও গার্মেন্টস্ শ্রমিকরা এ বছরও আন্দোলন করেছে।

বিশ্ব অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা, অভিবাসী শ্রমিকদের নির্যাতন, প্রতারণা ও বঞ্চনার ধারাবাহিকতা এ বছরও অব্যাহত ছিল। তারা একদিকে যেমন অব্যাহতভাবে দেশি রিক্রুটিং এজেন্সির দ্বারা প্রতারিত হয়েছে, তেমনি

অন্যদিকে বিদেশে তারা নিয়োগ কর্তার দ্বারা ক্রীতদাসের মতো ব্যবহার পেয়েছে। শ্রম রপ্তানি হচ্ছে এমন দেশের সাথে দ্বিপক্ষীয় চুক্তি এবং বাংলাদেশে তাদের অধিকার রক্ষার জন্য পর্যাপ্ত আইনি ব্যবস্থার অভাবে অভিবাসী শ্রমিক নির্যাতন এবং মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ বিশেষ করে বাহরাইন, কুয়েত এবং সৌদি আরব থেকে তাদের ফেরত পাঠানোর ঘটনা ঘটেই চলেছে। ফেরত পাঠানো শ্রমিকদের জন্য বাংলাদেশে কোনো বিকল্প সুযোগ সৃষ্টিরও ব্যবস্থা রাখা হয়নি।

শিক্ষাক্ষেত্রে সহস্রাব্দের লক্ষ্যমাত্রা এ বছর উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নিতলাভ করেছে। প্রাইমারি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ও সুপারভিশনের দায়িত্ব দেয়া হয় বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাকের ওপর। সরকারের এই সিদ্ধান্ত নতুন একটি বিতর্কের জন্ম দেয়। তাছাড়া নিম্নমানের পাঠ্যবই নিয়ে বছরজুড়েই জনমনে উদ্বেগ বিরাজ করছিল। সময়মতো পর্যাপ্ত পরিমানে বই সরবরাহ নিয়েও ছিল উদ্বেগ। অধিকন্তু বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না বললেই চলে। শিক্ষাঙ্গনের দুর্নীতি ও সংঘাত নিরসনে এ বছর সরকারের কিছুটা উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায়, বিশেষ করে শিক্ষাঙ্গনে যৌন হয়রানি রোধে একটি খসড়া নীতি প্রণয়নসহ বেশ কিছু পদক্ষেপ নেয়া হয়।

শিশুশ্রম নিরসন নীতি এবং জেলে আটক শিশুদের নিয়ে হাইকোর্টের রায় ঘোষণাসহ এ বছর বেশ কিছু ইতিবাচক উন্নয়ন হয়। কিন্তু তারপরও ঝুঁকিপূর্ণ কাজ বিশেষ করে জাহাজ ভাঙার কাজে শিশুদের নিয়োগ প্রসঙ্গে উদ্বেগ অব্যাহত ছিল। শিশুদের সাথে দুর্ব্যবহার ও নির্যাতন রোধে এ বছরও সরকারের কোনো কার্যকর পদক্ষেপ গৃহীত হয়নি।

উপসংহার : নতুন সীমানা?

২০০৭ সালের মানবাধিকার প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, অধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা প্রতিবছরই আগের তুলনায় বৃদ্ধি পাচ্ছে। নির্বাচিত সরকার নাকি সামরিক সরকার কে ক্ষমতায় আছে– সেটা মানবাধিকার লঙ্ঘনের ক্রমবৃদ্ধিতে কোনো প্রভাব ফেলেনি। নির্বাচিত ও সামরিক উভয় সরকারের আমলেই কিছু কিছু বিষয়ে সাদৃশ্য দেখা গেছে। যেমন অপরাধের বিচারহীনতা এবং কর্তৃত্বপরায়ণ মনোভাব উভয় সরকারের আমলেই বহাল ছিল।

ডিসেম্বরের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বিপুল বিজয় লাভ করে। এই বিজয় গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণে

তাদের নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি করেছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শুরু করা রাজনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার অব্যাহত থাকা না থাকা নিয়েও তারা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবে। এটা অত্যন্ত জরুরি যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকে জনগণের দাবির প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও জবাবদিহি থাকতে হবে। জনগণের দাবি অনুসারে তাদের সহনশীল ও রাজনৈতিক উপায়ে যুদ্ধাপরাধের বিচার করতে হবে এবং সেই সাথে মানবাধিকার লঙ্ঘন ও ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ করতে হবে। এসবের জন্য প্রয়োজন কাঠামোগত সংস্কার যা সরকারের প্রতি-তটি প্রতিষ্ঠানকে আরো কার্যকর ও দলীয় প্রভাবমুক্ত করবে।

বস্তুত দেশের সামগ্রিক মানবাধিকার পরিস্থিতিকে দ্রুত সমুন্নত করার জন্য প্রয়োজন একটি স্থিতিশীল রাজনৈতিক সংস্কৃতি। আর এজন্য দরকার প্রধান দুটি রাজনৈতিক দলের মধ্যে সহযোগিতা ও সহনশীলতা। যদি সদিচ্ছা থাকে তাহলে নবনির্বাচিত রাজনৈতিক সরকার সহজেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ইতিবাচক পদক্ষেপগুলোকে অনুমোদন দিতে পারে। কিন্তু যেসব কাজের মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার আইন-বহির্ভূতভাবে গ্রেফতার করেছে, আটক করেছে অথবা যেসব কাজের মাধ্যমে নির্যাতন করা হয়েছে কিংবা যেসব কাজের মাধ্যমে বিচার-বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়েছে, যদি সেসব কাজকে অনুমোদন দেয়া হয় তাহলে রাজনৈতিক সরকারের জন্য নাজুক পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে। যদি এরূপ করা হয় তাহলে বিচারহীনতার সংস্কৃতিকে আরো উৎসাহিত করা হবে এবং জরুরি অবস্থার মধ্যে যেভাবে প্রয়োজনাতিরিক্ত ও অন্যায়ভাবে ক্ষমতা ব্যবহার করা হয়েছে তাকে প্রশ্রয় দেয়া হবে। নাগরিক সমাজ দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযানকে স্বাগত জানিয়েছিল। সুতরাং রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য ধ্বংস ডেকে আনবে যদি তারা নাগরিকদের এই অনুভূতিকে অবজ্ঞা করে এবং আগের মতোই দুর্নীতিতে লিপ্ত হয়।

রাজনৈতিক দলগুলো তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে জনগণের কাছে অনেক অঙ্গীকার করেছে, এর মধ্যে কিছু কিছু অঙ্গীকার বাস্তবায়নযোগ্য আবার কিছু কিছু বাজারের ফর্দের চেয়ে বেশি কিছু নয়। অন্যদিকে জনগণের স্বাধীনতা, মানবাধিকার, নারীদের অধিকার নিশ্চিত করা, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সামাজিক বৈষম্য কমিয়ে আনা, তাদের অধিকার সুরক্ষা করা এবং কার্যকর রাজনৈতিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য জনগণও তাদের অগ্রাধিকারগুলো রাজনৈতিক দলকে জানিয়েছে। যারা সংসদে বসবে তাদের এখন জনগণের এসব বক্তব্য শুনতে হবে। জনগণ স্পষ্ট করেই ঘোষণা করেছে যে তারা নিশ্চুপ ও নিষ্ক্রিয় থাকবে না, তারা পরিবর্তন চায়।

এ বছর উল্লেখযোগ্য যেসব সাফল্য এসেছে সেগুলোর কৃতিত্বের প্রধান দাবিদার হলো জনগণ। উদাহরণস্বরূপ যুদ্ধাপরাধের বিচারের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের সামনে আনার দীর্ঘদিনের যে দাবি এবং জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে যুদ্ধাপরাধীদের বৈধতা নিয়ে জনমনে যে প্রশ্ন তার ফলেই জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ঐক্যজোটের ভরাডুবি হয়েছে। জনগণের সংগ্রাম ও প্রতিবাদের ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে। রাজনৈতিক সংস্কৃতির জয়লাভ হলেও কিছু লোক আছে, যারা ধর্মীয় রাজনীতির নিয়ন্ত্রিত।

জাতীয় নির্বাচনের ফলাফল থেকে শেষ পর্যন্ত এটাই প্রতীয়মান হয় যে, জনগণ বিচারহীনতার সংস্কৃতিকে প্রত্যাখ্যান করেছে, জনগণের দাবি এমন একটি দায়িত্বশীল ও জবাবদিহিতামূলক সরকার যারা যুদ্ধাপরাধী ও মানবাধিকার লঙ্ঘনকারীদের বিচারের সামনে আনবে, যারা দুর্নীতি ও মিথ্যাচার এবং বিচার প্রক্রিয়ার বিকৃতিকে সমূলে উপড়ে ফেলবে, যারা সমতা ও ন্যায়বিচারের নীতি প্রতিষ্ঠা করবে এবং যারা খাদ্য ও বাসস্থানসহ মানুষের মৌলিক মানবাধিকারকে রক্ষা করার নিশ্চয়তা বিধান করবে। আসক সরকারকে জনগণের এসব দাবির প্রতি দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানাচ্ছে।

অনুবাদ : এটিএম মোরশেদ আলম